কানসাট: মানুষের জাগরণ আর বিদ্যুতায়নের 'পূর্ব-পশ্চিম'

কাবেরী গায়েন

কানসাটের মানুষ গত নয়মাস ধরে বিদ্যুতের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করছেন, জীবন দিয়েছেন এ পর্যন্ত ২০ জন, আর আহত হয়েছেন কতজন তার প্রকৃত হিসেব আর কেই-ই বা রাখতে পেরেছে। বিদ্যুতের এই দাবি ন্যায্য বললেও বোধহয় সবটা বোঝানো যায় না, এ দাবি একেবারেই তাঁদের অস্তিত্বের সাথে, জীবন-জীবীকার সাথে সম্পর্কিত- বিদ্যুৎ পেলে তাঁরা ধানের জমিতে সেচ দেবেন। এই দাবি দেশবাসির স্বার্থসংশ্লিষ্টও বটে। সরকার এবং পাতি-উপ সব ধরণের কর্তৃপক্ষের সকল হুমকি, নির্যাতন আর হত্যার বিপরীতে হাজারো সাধারণ মানুষের উৎসার্জন বাংলাদেশে গণআন্দোলনের এক যুগান্তকারী ইতিহাস নির্মাণ করেছে। আমাদের সামগ্রিক দেউলিয়া রাজনীতির বিপরীতে সাধারণ মানুষের এই জাগরণ নতুন আশা আর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারচেয়েও বড় আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক নতুন মোড় নিয়েছে, আমরা বুঝি বা নাই-ই বুঝি। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে আমাদের প্রচলিত রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা। দেশে সরকার একটা আছে নিশ্চয়ই, তবে সে সরকার গরীবের নয় বলাই বাহুল্য, ন্যায্যমূল্যে সারের দাবি করে প্রজাতন্ত্রের পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ১৮ জন, আর এবার কৃষক মরলেন বিদ্যুতের দাবিতে, দশ বছরের শিশু আনোয়ার আর কিশোর নয়ন এবং জিলানীসহ মোট ২০ জন। আছে হরেক রাজনৈতিক দল কিন্তু মানুষের কাজে লাগে এমন কোন ইস্যুতে তাদের আগ্রহ সামান্যই। তা সেটা আদমজী তুলে দেয়াই হোক বা হোক পোশাক কারখানার পুড়তে থাকা মেয়েরা বা রক্তাক্ত কানসাট । যে মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা এতোই প্রান্তিক যে এমনকি দেশের 'ভাবমূর্তি' নষ্ট করার অভিযোগেও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়া সম্ভব নয়। পত্রিকার পাতায় তাঁদের প্রতিরোধ-অস্ত্রের যে তালিকা পাওয়া যায় সেখান থেকেও তাঁদের প্রান্তিকতার স্বরূপটা বুঝতে কষ্ট হয় না- ঝাড়ু, লাঠি, তীরধনুক, বল্লম, হাসুয়া। আর গ্রামের কিছু চাষী বিদ্যুতের দাবিতে প্রাণ দিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে, এহেন 'সামান্য' বিষয়ে প্রচলিত কোন রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা থাকবে এমন অপবাদ এমনকি 'তোতাকাহিনী'র অতিবড় নিন্দুকও রটাতে পারবে না। তাহলে কোন সে শক্তি যা নড়িয়ে দিলো, জাগিয়ে তুললো নিভৃত শিবগঞ্জের কানসাট এলাকার ২৫ হাজার নারী-পুরুষকে এতটা প্রচন্ডভাবে? আমার অল্প বুদ্ধিতে বুঝি, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রবল মানুষসত্ত্বা সুপ্ত আছে, যাকে প্রতিনিয়ত তাড়াতে তাড়াতে অস্তিত্বহীন করে ফেলার অবিরত কষরৎ নিষ্পেষণকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের, নষ্ট রাজনীতির- রুখে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষসত্ত্বা - হত্যা বা ১৪৪ ধারা জারি করে এই জাগ্রত সত্ত্বার মোকাবেলা করা সম্ভব না। ধোবড়া শাহবাজপুরের যে রিপন বলছেন, "আমরা মৃত্যুভয়ে ভীত নই" (৮ এপ্রিল, প্রথম আলো) কিংবা চককীর্তি থেকে আসা নারীদের মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যে ৪ জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত নয়ন কর্মকারের মা চঞ্চলা কর্মকার - তাঁদের কে ঠেকাবেন? হয়তো সাময়িকভাবে দমন করা যেতে পারে। মানুষ যখন তাঁদের ন্যায্য দাবিটা জীবনের দামে চিনে নিতে পারেন এবং সেই দাবি আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন, তখন তাঁরা মানুষের বিভায় উদ্ভাসিত, তাঁদের সালাম।

প্রান্তিক মানুষের এই জাগরণ নিয়ে আলোচনা হতে থাকবে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে বিদ্যুতের দাবিকে ঘিরে এতো হত্যা, মধ্যরাতে ঘরে ঘরে সংহার অভিযান চালালো পুলিশ, ঘর-ছাড়া করলো গ্রামের পর গ্রাম মানুষকে চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিতে, 'শক্তহাতে মোকাবেলা' করাই কি সেই দাবির শেষ পরিণতি না কি বিদ্যুত সমস্যার সমাধান নিয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে? বিদ্যুৎ যে শুধু কানসাটে নেই তা তো নয়, সারাদেশেই সংকট। আজ কানসাটকে নাহয় দমন করা হলো, যেমন দমন করা হয়েছিলো তেভাগার আন্দোলনকে, কাল যে বগুড়া থেকে একই আন্দোলন গড়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে? তখনও কি গণবিদ্রোহকে মোকাবেলাই হবে একমাত্র করণীয়? বিদ্যুৎ সমস্যার কারণগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর কথাই যথার্থ মনে হয়েছে, 'বিদ্যুৎ ব্যবস্থা শুধু উৎপাদন নিয়ে নয়, একই সঙ্গে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাও এর সাথে জড়িত' (১২ এপ্রিল, প্রথম আলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শক্তি নীতিমালা ২০০৪ (ন্যাশনাল এনার্জি পলিসি)-র প্রথম দুটি উদ্দেশ্য খুবই র‍্যাডিক্যাল। আমি শুরু করছি দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থেকে - 'দেশের বিভিন্ন জোনের এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক গ্রুপের শক্তি চাহিদা মেটানো'। এই নীতিমালার ৪.২.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দেশে সংস্থাপিত সকল বিদ্যুৎ প্লান্টের কার্যকর অপারেশন ক্ষমতা ৪০৫৫ মেগাওয়াট যদিও এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন রেকর্ড ৩১৭১ মেগাওয়াট (০৬-০২-২০০২) যেখানে সর্বোচ্চ চাহিদা ৩৪৫৯ মেগাওয়াট (২০০১ সালের হিসাব)। সেক্ষেত্রে চাহিদা আর উৎপাদনের ফারাক তেমন প্রকট নয়। তবে সংস্থাপিত বিদ্যুৎ প্লান্ট রয়েছে ৪২৩০ মেগাওয়াট যার মধ্যে ৩৪৭৫ মেগাওয়াট সংস্থাপিত পূর্বজোনে এবং মাত্র ৭৫৫ মেগাওয়াট পশ্চিম জোনে। যমুনা এবং মেঘনা নদীর পশ্চিম দিকে হলো পশ্চিম জোন, বরিশাল, খুলনা,

রাজশাহী বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর। আর পূর্বজোন হলো চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং সিলেট বিভাগ, বৃহত্তর ফরিদপুরকে বাদ দিয়ে। একটি ২৩০ কিলোভোল্ট সামর্থের সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে এই দুই জোনের মধ্যে সংযোগ সাধন করা হয়েছে ১৯৮২ সালে, যার সঞ্চালন সামর্থ এই রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৪৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ফলাফল? সিআইএ বাংলাদেশ কান্ট্রি অ্যানালাইসিস ব্রিফের তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ৭৮ ভাগ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে পূর্ব জোনে, বৃহত্তর ঢাকাই ব্যবহার করছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

এরপরে আসা যাক প্রথম উদ্দেশ্যে - 'সাসটেইনেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শক্তি সরবরাহ করা যেনো বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেক্টরের উন্নয়ন শক্তির অভাবে ব্যহত না হয়'। যদিও প্রায় ৬৪ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত এবং আমাদের জিডিপি'র ২০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে আবারো ৪.২.১ অনুচ্ছেদ, মোট বিদ্যুতের ৪১ শতাংশ ব্যবহৃত হয় বাসাবাড়িতে, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হয় ৮ শতাংশ, শিল্প কারখানায় ৪৪ শতাংশ, সেচ কাজে মাত্র ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ২ শতাংশ।

এবার আসা যাক সিস্টেম লস প্রসঙ্গে। নীতিমালার ৪.২.৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, গত পঁচিশ বছরে সিস্টেম লস ২৭.২ শতাংশ থেকে ৪০.২ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। টেকনিক্যাল সিস্টেম লস সবচেয়ে কম রুরাল ইলেকট্রিক বোর্ডের (REB), যা ৩৩/১১ কিলোভোল্টের সাব-স্টেশন গুলোর মধ্যে ৮ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। শুধু তাই নয় বিদ্যুৎবিল আদায়ের ক্ষেত্রেও পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের সাফল্য ডেসা বা অন্যান্য বিদ্যুৎ বোর্ডের চেয়ে অনেক বেশী। তা'হলে সোজা কথায় দাঁড়াচ্ছে, দেশের মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে পশ্চিম জোন দারুণভাবে বঞ্চিত, কৃষকরা ব্যবহার করছেন সবচেয়ে কম বিদ্যুৎ এবং বিল পরিশোধ করছেন সবচেয়ে নিয়মিতভাবে। বিল পরিশোধ করেও তারা বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। কেন বারে বারেই এই পশ্চিম জোনের, বিশেষত রাজশাহী বিভাগের খরা-পীড়িত, অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে ঝাড়ু আর লাঠি হাতে পথে নেমে জীবন দিতে হয় সরকারী এই পরিসংখ্যান থেকেই তার কিছু ইঙ্গিত কি আমরা পাই? কিছুই কি করার নেই আমাদের ?

আজ নববর্ষের শুরুর দিনে কানসাটের সকল বিদ্যুৎ শহীদদের, আন্দোলনরত এবং ঘরছাড়া মানুষদের অভিবাদন জানাই।

১ বৈশাখ ১৪১৩
এডিনবরা

কাবেরী গায়েন: শিক্ষক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল: kgayenbd@yahoo.com